।।প্রকল্প পত্র।।

পত্র-১০৩

বিষয় : পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলার নারীসমাজ

নাম : দীপক পাত্র

P.hD Course Work

ক্রমিক সংখ্যা- **BUR CW(JUL)B 2019/7**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর- **027983 OF 2008-2009**

শিক্ষাবর্ষ– ২০১৯

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

গোলাপবাগ, বর্ধমান

পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলার নারীসমাজ

১৩৫০ বঙ্গাব্দ (১৯৪৩খ্রিস্টাব্দ) এর মন্বন্তর সমকালীন সমাজচিত্র নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছে। এই মন্বন্তর কোন প্রাকৃতিক খেয়াল ছিল না। ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসন, ব্রিটিশ শাসকের উদাসিনতা ও মজুদকরণ এবং সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির আশঙ্কায় মানুষ সৃষ্ট ছিল এই মন্বন্তর। কালোবাজারি, মজুতদার, পাচারকারী ও নারী ব্যবসায়ীরা সমাজের বুকে প্রবল বিপর্যয়ের অন্ধকার নিয়ে এসেছিল। এই সময় খাদ্যশস্যের কৃত্রিম শূন্যতা থেকে হাহাকার, অনাহার_অভুক্তি ও মৃত্যু পরিচিত ঘটনা। স্বাভাবিকভাবে সমাজ তথা পারিবারিক বন্ধনও আলগা হতে থাকে।সমান্তরালে অর্থ ও খাবারের মজুদদার কালোবাজারীরা মুনাফা লুণ্ঠনের সুবর্ণ সুযোগে মেতে উঠেছিল। অন্যদিকে সম্পন্ন লম্পট পুরুষরা দুর্ভিক্ষের সুযোগে অসহায় নারীর সম্ভ্রমহানি করতে মেতে উঠেছিল। পরিবার-পরিজনের দৃষ্টিজ্বালায় ক্লান্ত নারীরাও নিতান্তই নিরুপায় হয়ে আত্মসম্মান বিসর্জনে বাধ্য হয়েছিল। দুর্ভিক্ষ কবলে পড়া গৃহহারা, স্বজনহারা নিরন্ন মানুষের মিছিল থেকে ফুটপাতে সেই মরণযাত্রী মানুষগুলোর ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট খাদ্যের জন্য কাড়াকাড়ি ছিল চেনা ঘটনা। এমনকি অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্র বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত স্বামী সন্তানের মুখে দু'মুঠো খাবার তুলে দিতে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছিল। যেহেতু সময়টা ছিল দুর্ভিক্ষের, তাই নারীরা আত্ম-লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে আত্মসম্ভ্রম এর কথা ভুলে সময়ের স্রোতে টিকে থাকার লড়াইয়ে পর-পুরুষের কামনায় সমর্পিত হতে বাধ্য হয়েছিল।

প্রশাসনের উদাসীনতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুষ্টিমেয় মানুষের কায়েমী স্বার্থের লালসায় ভারসাম্য হারিয়েছিল সমাজব্যবস্থা। খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান হারিয়ে মানুষ জ্ঞানশূন্য হয়ে হারিয়েছিল তাদের নৈতিকবোধ। আর এই সামাজিক অবক্ষয়ে সবচেয়ে বেশি রক্ত ক্ষরিত হয়েছিল নারীদের শরীরে ও মনে। একদিকে জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে স্বামীর অসহায় পরাজয় এবং সন্তানের অভুক্ত পেটের কান্না, অন্যদিকে খাদ্যের টোপে লম্পট মজুমদার ও সমাজ প্রভুদের লালসার আহ্বান একটা সময় সমস্ত আত্মমর্যাদার অলঙ্কারের ভূষণ উন্মোচিত করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সতীত্বের বিনিময়ে খাদ্য বস্ত্রের সংস্থানে নারীরাই যেন প্রকৃত পুরুষের যোগ্য হয়ে উঠেছিল সে সময়।

দুর্ভিক্ষকালীন সমাজের করুণ চিত্র ও জীবন বিপর্যয়ের নানান ছবি ফুটে উঠেছিল সমাজ সচেতন শিল্পীদের কলমে। উপন্যাস,নাটকের পাশাপাশি বাংলা ছোটোগল্পের নিদর্শন কম ছিল না। অনেক

গল্পকারদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রমূখ গল্পকারের নির্বাচিত কয়েকটি গল্প থেকে আমরা সেই মন্বন্তর কালের সমাজ জীবনে নারীদের করুন কাহিনী কে ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে বেশি জীবন্ত পাই। আমাদের নির্ধারিত আলোচনা ও গবেষণার বিষয় "পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলার নারী সমাজ" সন্ধ্যার বকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব।

প্রথম অধ্যায়: অসহায় পুরুষ ও দুঃখ মোচনে নারীর কর্মপ্রয়াস।
দ্বিতীয় অধ্যায়: ক্ষুধার্ত পরিবার ও সংগ্রামী নারীর আত্মবিসর্জন।
তৃতীয় অধ্যায়: মাতৃত্ববোধ বনাম আত্মসম্মানের সংকট ও নারী।
চতুর্থ অধ্যায়: বস্ত্র সংকট ও নারীর সম্ভ্রম।
পঞ্চম অধ্যায়: সংকটে নারী ও সংকটতারিণী নারী।

প্রথম অধ্যায়:

অসহায় পুরুষ ও দুঃখ মোচনে নারীর কর্মপ্রয়াস:-

দুর্ভিক্ষকালীন সমাজের একটি পরিচিত সমস্যা ছিল বাড়ির পুরুষকর্তাদের স্ত্রী সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার অসামর্থ্যতা, অভুক্ত পরিবার সদস্যদের খাদ্যের হাহাকার, রোগ মৃত্যুতে নিরুপায় পুরুষরা জীবন বাজি রেখে উপার্জনে বেরিয়ে পড়তো। আবার বাধ্য হয়ে কখনোওবা শূন্য হাতে বাড়ি ফেরার লজ্জা সইতে না পেরে ফেরারই হয়ে যেত। স্বামীহীনা অসহায় নারীরা প্রথমে ভিক্ষায় নামতো। কিন্তু তখন রাস্তায় ভিক্ষাদাতার থেকে ভিক্ষুকের সংখ্যা বেশি থাকায় বাধ্য হয়ে নারীরা পরপুরুষের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছিল। এই চিত্র পাই গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজ-কাল-পরশু' গল্পে। স্বামী পরিত্যাক্তা মুক্তা মৃত্যুমুখী সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে রাস্তায় নেমে দুর্বৃত্তদের হাতে আক্রান্ত হয়। তাই প্রতি মুহূর্তে মরার থেকে দাস বাবুর ঘৃণ্য প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় মুক্তা। সোমনাথ লাহিড়ীর '১৯৪৩' গল্পেও প্রায় একই দৃশ্য পাই। স্বামী বিষ্টু নিজের অকর্মণ্যতা স্ত্রী রানীকে ছেড়ে পালায়। অসহায় রানীর দুরাবস্থার সুযোগ বুঝে বাড়ুয্যেবাবু সাহায্যের প্রলোভনের টোপে রাণীকে গ্রাস করে। _"আমার সঙ্গে চলে আয় অনেক ভাত দেব"।[১] বলাই বাহুল্য বাড়ুয্যেবাবুর এই আহবানে সাড়া দিয়ে রানীকে তার ভাতের দাম দিয়ে হয় নিজের সতীত্বের বিনিময়ে। অবশ্য মন্বন্তরকালীন সমাজে

অনেক নারী আত্মসম্ভ্রম বাঁচিয়ে জীবনযুদ্ধে নিজেকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টাও করেছিল । পরীমল গোস্বামীর 'ভাঙ্গন' গল্পের লক্ষীর মধ্যে সেই চেষ্টা লক্ষ্য করি। পতিতাবৃত্তিতে না গিয়েও সে অন্নসত্রতে খাবার পরিবেশনের কাজে যোগ দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে।

অনেকক্ষেত্রেই নারীরা স্বেচ্ছায় আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে। সচেতনভাবেই তারা পতিতাবৃত্তির খাতায় নাম তুলেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নেড়ী' গল্পে তারা ও মনা'র মধ্যে এই দৃশ্য পাই। এখানে গৃহকর্তা গগন সংসার ত্যাগ করে। অসহায় স্ত্রী তারা চালের জন্য হৃদয় পণ্ডিতের ঘৃণ্য প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু কন্যা মনা অল্প বয়সী বলে তার বাজার মূল্য বেশি। হৃদয়বাবু আবার মনা'কে চড়া দামে অন্যত্রে পাচার করে দেয়। মানিক বাবুর 'অমানুষিক' গল্পেও প্রায় একই ছবি পাই। গৃহকর্তা ছিদাম দুর্ভিক্ষ সামাল দিতে না পেরে গৃহত্যাগ করে। অনাহারে ছিদামের মা ও কন্যা মারা যায়। যুবতী স্ত্রী কুজ্জা প্রাণ বাঁচাতে ললিত বাবুর রক্ষিতা হয়ে যায়। ললিতবাবুর আশ্রয়ে আবার কুজ্জা বেশ স্বাস্থ্যবান হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে ছিদাম এর সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

ক্ষুধার্ত পরিবার ও সংগ্রামী নারীর আত্মবিসর্জন

দুর্ভিক্ষকালীন সমাজে নারীরা, বিশেষ করে কন্যারা পিতা-মাতার আগ্রহ ও সম্মতিতে নিজেকে পন্য করতে বাধ্য হয়েছিল। এই ছবি পাই নবেন্দু ঘোষ এর 'কল্কি' গল্পে। এখানে কমলা নামের মেয়েটি বাবা-মায়ের নির্দেশে প্রতিবেশী যুবকের হাত ধরে বেরিয়ে যায়। অবশ্য বাবা-মায়ের বিড়ম্বনাও কম নয়। _"রাত্রি বাড়ে কমলা ফিরিয়া আসে।.... এনেছিস, ভাত এনেছিস?.. দে আমায় দে! বা! রে গতর খাটিয়ে আনলাম, আমি খাব না?"[২] এইভাবে বাবা-মায়েরা অসৎপথে অন্ন সংগ্রহের প্রেরণাদাতা হয়ে কন্যার বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে।

নবেন্দু ঘোষ এর 'ত্রিশঙ্কু' গল্পেও প্রায় একই দৃশ্য পাই। তিন সন্তান ও স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দিতে অক্ষম পিতা মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধ ত্যাগ করেছে। কন্যা সীতাকে প্রতিবেশী যুবক নিমুর সঙ্গে অবাধ মেলামেশাতে উৎসাহ যুগিয়েছে। বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহের বেঁচে থেকেছে।

অনেকক্ষেত্রে নারীরা অসহায় যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজেরাই নিজেদের পণ্য করেছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মত সংবেদনশীল লেখকের তা দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এই দৃশ্য তাঁর 'হাড়'

গল্পে নারী বিক্রয় ও নারী অবমাননার এই দৃশ্য পাই। গল্পের নায়িকা মানাদা রুগ্ন স্বামীকে বাঁচাতে স্বেচ্ছায় ১০ টাকার বিনিময়ে নিজেকে ঠিকাদারের হাতে বিক্রি করে। আরো বেশি দামের আশায় নিজেকে বিক্রি করতে চায়। স্বামী কান্তারাম স্ত্রীকে বলে "আবার ফিরে আসবি?....আমি থাকবো তোর পথ চেয়ে"।[৩]

একজন নারী কোন অবস্থায় পড়লে নিজেকে এইভাবে বাজারে বিক্রি করতে যায়, তা মানদা'র মতো চরিত্রকে দেখেই বোঝা যায়। পিতা কর্তৃক কন্যার পতিতাবৃত্তির নমুনা পাই পিতা কেশব কন্যা শৈল্যকে নারীব্যবসায়ী কালাচাঁদের হাতে বিক্রি করে দেয়। গল্পাকারের ভাষায়- "অন্ন নেই, কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। সেইসঙ্গে নগদ টাকাও, যা দিয়ে কয়েকখানা বস্ত্রও কেনা যেতে পারে"।[৪]

অবশ্য এই গল্পে কেশব পিতৃসত্তাকে পুরোপুরি হত্যা করতে পারেনি। তাই শৈল্যকে নামমাত্র বিবাহে কালাচানদের হাতে তুলে দিয়ে নিজের বিবেক দংশন থেকে মুক্তি খুঁজেছে। দুর্ভিক্ষের বাজারে কালাচাঁদের মতো নারীব্যবসায়ীদের ব্যবসায় উন্নতি ঘটে। কারণ নারী তখন সহজলভ্য। কিন্তু শৈল্যর ক্ষেত্রে কালাচাঁদের পত্নীমায়া জাগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৌদি মন্দোদরীর ঈর্ষাতে শৈল্যকে কালাচাঁদ গণেশের কাছে বিক্রি করে। গনেশও অর্থের বিনিময়ে শৈল্যর সতীত্ব কেড়ে নেয়। এক্ষেত্রে আবার নারীর প্রতি নারীর ঈর্ষা ও সর্বনাশের ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করি।

তৃতীয় অধ্যায়:

মাতৃত্ববোধ বনাম আত্মসম্মানের সংকট ও নারী:-

মন্বন্তরপীড়িত সমাজকে নিয়ে লেখা ছোটগল্পগুলিতে নারীর মাতৃত্ববোধ ও সন্তানস্নেহের দৃশ্যও কম ছিলনা। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ক্ষুধা' গল্পে দেখি জীবনকৃষ্ণের স্ত্রী সন্ধ্যা স্বামীর অবাধ্য হয়ে সন্তানের ক্ষুধা মেটাতে কন্ট্রোলের লাইনে দাঁড়িয়েছে। মেঝেতে পড়ে থাকা দু-দানা ভাতের জন্য ছেলেমেয়েদের হিংস্র মারামারি সন্ধ্যার মাতৃহৃদয়কে কুরে কুরে খেয়েছিল। _"মা হয়ে ছেলেমেয়েদের খাওয়া দেখছি, মনে হয় পাগল হয়ে যাব বুঝি"৫। কিন্তু সন্তানসম্ভবা সন্ধ্যা কন্ট্রোলের লাইনেই সন্তান প্রসব করে। কোন পরিস্থিতিতে একজন সন্তানসম্ভবা মাকে সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে খাদ্যের সন্ধানে নামতে হয় তা সন্ধ্যাকে দেখেই বোঝা যায়।

নবেন্দু ঘোষ এর ‘কল্কি’ গল্পেও মাতা তারা ক্ষুধায় উন্মত্ত সন্তানদের জন্য উদ্ভ্রান্ত হয়েছে। ক্ষুধার্ত সন্তানদের ক্ষোভ _”খেতে দে আমায় রাক্ষসী, শিগগির খেতে দে....”[৬]। খাদ্যদানে অক্ষম মাতা তারা শুধু হাউ হাউ করে কেঁদে যায়। উত্তর দেওয়ার ভাষা খুঁজে পায় না।

চতুর্থ অধ্যায়:

বস্ত্র সংকট ও নারীর সম্ভ্রম:-

খাদ্য সংকটের পাশাপাশি বস্ত্র সংকটেও নারীরা সম্ভ্রম হারিয়েছিল। বস্ত্র কালোবাজারী ও চোরাচালানকারীদের জন্য বাংলার নারীরা অর্ধনগ্ন হয়েছিল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘দুঃশাসন’ গল্পে বস্ত্র সংকটের দৃশ্য পাই। এখানে যাত্রার অভিনয়ের মাধ্যমে বাস্তবের দ্রোপদীদের বস্ত্র হরণের নির্মম দৃশ্য তৎকালীন বস্ত্র সমস্যার কথাই ইঙ্গিতে বোঝানো হয়েছে। যাত্রা শেষে পথের পাশে দেবিদাস বাস্তবের বস্ত্র হরণের প্রকৃত দৃশ্য দেখতে পায় ডোম পাড়ার ছোট্ট মেয়েটিকে সম্পুর্ন নগ্নরুপে ছুটে পালানোর চেষ্টায়।_ “মেয়েটির সম্পুর্ন নগ্ন। কোনখানে একফালি কাপড় নেই। কাপড় পরার উপায়ও নেই”[৭]।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘আবরণ’ গল্পেও নারীর বস্ত্র সংকটের চিত্র পাই। এই গল্পে গৃহবধূ বস্ত্রাভাবে প্রায় নগ্ন। স্বেচ্ছায় সে গৃহবন্দীও। স্বামীকে ভাত দিতে পর্যন্ত সে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। স্বামী বংশী ঘুমন্ত চাপার নগ্ন শরীর দেখে শিউরে উঠে। চাপার শরীর ঢাকতে বংশী কাপড় চুরি করতে যায়। কিন্তু সে মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ধরা পড়ে। সেখানে বৃদ্ধার একমাত্র কাপড় চুরি করতে গিয়ে বিবেক দংশিত হয়। কেননা পতিতা বয়স্কা নারীর নিরাবরণ দেহ অনেক বেশি কুশ্রী। এইভাবেই বিভিন্ন গল্পে নারীর বস্ত্র সমস্যা ও তার বিড়াম্বনা আলোচ্য মন্বন্তর কে অগ্রগামী করেছিল।

বিপরীত ক্ষেত্রে অবশ্য অনেক সম্পন্ন পরিবারের মেয়েদের সুদৃশ্য কাপড়ের ঝলকানি বৈষম্যতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়:

সংকটে নারী ও সংকটতারিণী নারী:-

মন্বন্তর সমকালীন সমাজের নারীদের এই দুরবস্থার কারণে একমাত্র শুধু লম্পট বা মুখোশধারী পুরুষরাই দায়ী ছিল না। নারীদের এই করুন পরিনতির নেপথ্যে কিছু কপট নারীদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য নারীরা এই কপটতার আশ্রয় নিয়েছিল কেবলমাত্র তাদের নিজ দুরাবস্তা তাগিদেই। নানান ছলাকলায় অনেক মেয়েদেরই ভুল বুঝিয়ে নিয়ে এসে লম্পট নারীলোভী পুরুষদের হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে ছিল কিছু নারী। অর্থাৎ নারীদের পতিতাবৃত্তিতে নারীরাই প্রেরণা যুগিয়েছিল।

প্রবোধকুমার সান্যাল এর 'অঙ্গার' গল্পে পিসিমা চরিত্রটি হল মেয়েদের অসৎপথের প্রেরণাদাত্রীর প্রতিনিধি নারী চরিত্র। পিসিমা চরিত্রটির প্ররোচনাতেই যুবতী মিনু মেসবাড়ির আনাচে-কানাচে অন্ধকারের হাতছানিতে সাড়া দিয়েছে। আবার শোভনার মত যুবতীদের ঘরে রাত্রির অতিথি জোগাড়ে পিসিমার ভূমিকা অগ্রগণ্য।

নরেন্দ্র মিত্রের 'রসাভাস' গল্পে বাক্ চতুর পদ্মমণি চালের স্বামীহীনা সুশ্রী সোহাগীকে চালের কালোবাজারী মুকুন্দ দারোয়ানের কাছে এগিয়ে দিয়েছে। বিনিময় চালের চোরাকারবারীতে সেও সুযোগ নিয়েছে। আবার গ্রাম সম্পর্কে পদ্ম সোহাগীর মাসিও হয়। সোহাগীর প্রতি মুকন্দের আকর্ষন দেখে পদ্মর উক্তি _ "বাবু যেন কি, দোস্তুরী তো আগাম পেয়ে থাকি আমারা। আমি ওর আপন মাসি কিনা, একমাত্র গার্জিয়ান..."[৮]। এইভাবে পদ্মের মতো পাতানো মাসিরা সোহাগীদের দেখিয়ে হপ্তা নিতে লজ্জাবোধ করে না।

উপসংহার:-

মন্বন্তর আশ্রয়ী ছোটোগল্পগুলিতে নারী সমাজের দুর্দশার ছবি খন্ডাকারে প্রায় প্রতিটি গল্পে চিত্রিত হয়েছে। অসহায় নারীরা সংসারধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে রাস্তায় নামতে এমনকি শরীর বেচতেও বাধ্য হয়েছে। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অসহায় নারীর প্রতি লম্পট যুবকদের হিংস্র আচরণ সমকালীন সাহিত্যিকদের মর্মাহত করেছিল। অসহায় স্ত্রীকে স্বামীর ত্যাগ, এবং নারীর পণ্যে পরিণত হওয়া, মায়ের চোখের

সামনে সন্তানের মৃত্যুদৃশ্য বা বস্ত্রের অভাবে প্রায় নগ্ন শরীর নিয়ে আড়ালে থেকে নারীর বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা --এইসবই যন্ত্রণাদগ্ধ নারীর নির্মম পরিণতি। যা আমরা আলোচ্য ছোটোগল্পগুলিতে পেয়েছি। দুর্ভিক্ষপীড়িত নারীর সতীত্ব, মাতৃত্ব, ও মনুষ্যত্ব বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা। আর তার সুযোগ নিতে লোভী হিংস্র মানুষরুপী পশুরা ওত পেতে থেকেছে। তাই তাদের মুখোশ খুলে দিতে সামাজিক দায়বদ্ধসম্পন্ন সচেতন শিল্পীরা ছোটোগল্পের পর্দায় স্পষ্ট ছবি এঁকে দিয়েছেন। ছোটোগল্পগুলিতে চোখ রেখে আমরা আজকের দিনেও যে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের সেইসকল বিপন্ন নারীদের কান্না, সন্তান মৃত্যুর হাহাকার, অল্পবয়সী কন্যাদের অন্ধকার গলিতে হারিয়ে যাওয়ার ব্যথা অনুভব করি। এমনকি বৃদ্ধা পতিতার বস্ত্রহীন দেহ যেন লজ্জায় আমাদের চোখের পর্দা জোর করে টেনে দেয়।

সর্বোপরি গল্পকারেরা তাদের সহানুভূতির পাশাপাশি শিল্পনৈপুন্যেও বাংলা ছোটোগল্পে নারীর জীবন যন্ত্রণা, সংগ্রাম ও অবমাননার প্রতিচ্ছবি আমরা খুঁজে পেয়েছি আমাদের গবেষণা সন্ধর্ভে।

তথ্যসূত্র:

১. সোমনাথ লাহিড়ী, *পরিচয়, গল্পগ্রন্থ,* '১৩৪৩', ফাল্গুন ১৩৫০,পৃষ্ঠা ১১৩।
২. নবেন্দু ঘোষ, *মহামন্বন্তর, কল্কি,* প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৪৪,পৃষ্ঠা ১২৪ ।
৩. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *শতগল্প হাড়,* প্রথম প্রকাশ ১৩৫২, পৃষ্ঠা ১১৭।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১১৮।
৫. ড: সরোজকুমার রায়চৌধুরী, *ছোটগল্পের বিচত্র কথা,* পৃষ্ঠা ২১২।
৬. নবেন্দু ঘোষ, *মন্বন্তর, কল্কি, প্রথম* সংস্করণ মার্চ ১৯৪৪, পৃষ্ঠা ২২৫।
৭.নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *দূঃশাসন গল্পগ্রন্থ ' দুঃশাসন,* প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৫২, পৃষ্ঠা ৮৬।
৮. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, *অসমতল, রসাভাস,* প্রথম প্রকাশ ২২ শ্রাবণ ১৩৫২, পৃষ্ঠা ১২১।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'শতগল্প', প্রথম প্রকাশ ১৩৫২।
ড: সরোজকুমার রায়চৌধুরী, 'ছোটগল্পের বিচত্র কথা', ফাল্গুন ১৩৫০ ।
নবেন্দু ঘোষ, 'মন্বন্তর', প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৪৪।
নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 'অসমতল', প্রথম প্রকাশ ২২ শ্রাবণ ১৩৫২ ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘দু:শাসন গল্পগ্রন্থ’, প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৫২।
পরিমল গোস্বামী, ‘মহামন্বন্তর গল্প’, প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৪৪ ।
প্রবোধকুমার সান্যাল, ‘মন্বন্তর গল্প’, প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৪৪।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প’, প্রথম সংস্করণ ১৯৪৪ ।
সোমনাথ লাহিড়ী ‘পরিচয়,’ গল্পগ্রন্থ, ‘১৩৪৩’, ফাল্গুন ১৩৫০ ।

সহায়ক গ্রন্থ:

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ‘শতগল্প’
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় কালের পুত্তলিকা
ড. বিনতা রায়চৌধুরী, ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য’
নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, ‘সাহিত্যে ছোটোগল্প’
শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’